আহ্বান বা দাওয়াহ
মুসলিম উম্মাহর প্রধান মিশন

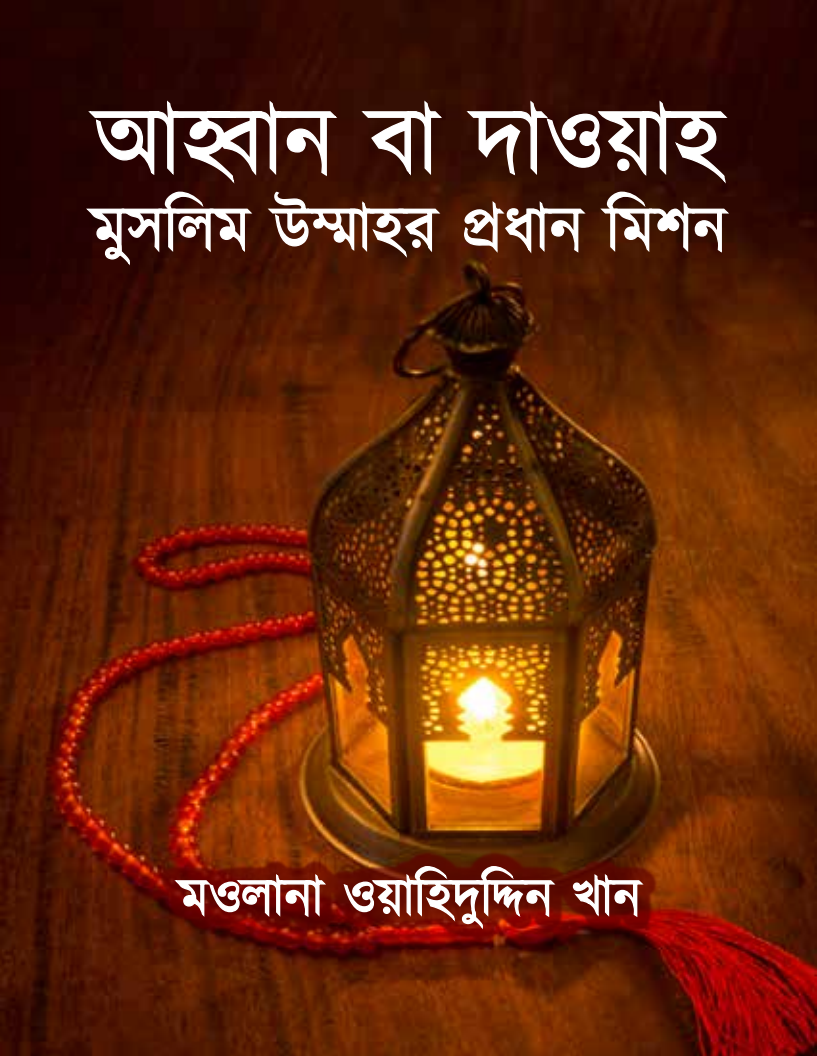

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

আহ্বান বা দাওয়াহ
মুসলিম উম্মাহর প্রধান মিশন

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

Goodword Books

প্রথম প্রকাশিত ঃ ২০২৩
অনুবাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী:

মুস্তাফা কামাল হায়দার (অনুবাদক)
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
সুবেদার মেজর মহিউদ্দিন মণ্ডল

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Forum
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

Printed in India

আহ্বান বা দাওয়াহ :
মুসলিম উম্মাহর প্রধান মিশন

সাক্ষ্যদান বা 'শাহাদাহ' একটি অত্যন্ত মহৎ কর্ম। যারা এই কর্মটি করেন, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করে সম্মানিত করবেন।

সাক্ষ্যদান বা 'শাহাদাহ' হলো মূলত আহ্বান বা 'দাওয়াহ'' বা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা। এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে মানবজাতির নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়। জীবনের বাস্তবতাটি তাদের নিকট এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে তা তাদের বোধগম্য হয়। এর লক্ষ্য হলো সত্য সন্ধানীদেরকে আল্লাহর সৃজন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা। যাদের সত্য অনুসন্ধানের কোনো ইচ্ছাই নেই, 'শাহাদাহ' এর মাধ্যমে তাদের নিকট সত্য সম্পর্কে অত্যাবশ্যক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয় যাতে তারা পরজীবনে এই দাবী করতে না পারে যে আল্লাহ তাদের নিকট কি চেয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না।

'শাহাদাহ' (সাক্ষ্যদান) বা 'দাওয়াহ' (আহ্বান) 'র কর্ম সম্পর্কে কুরআনে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা

হয়েছে, যেমন তাবলীগ (৫:৬৭) যার অর্থ ধর্মোপদেশ দেওয়া এবং 'সুসংবাদ প্রদান করা এবং সতর্ক করা' (৪:১৬৫)। 'শাহাদাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'সাক্ষ্যদান করা'। 'শাহাদাহ' ও 'দাওয়াহ' উভয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ একই, কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে জোর দেওয়ার একটি নিদান রয়েছে— অর্থাৎ, 'দাওয়াহ'র কাজে এমন পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হতে হবে যাতে এই কাজে যুক্ত ব্যক্তির সমস্ত সত্তা 'দাওয়াহ'র মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।

এটাই হলো স্বাক্ষ্যদান বা 'শাহাদাহ'। কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে 'শাহাদাহ'র দুটি স্তর— মৌখিক 'শাহাদাহ' এবং কার্যকরী 'শাহাদাহ'— এগুলি কুরআন সম্মত নয়। এই ধারণার প্রবক্তাগণের মতে লিখিত বা মৌখিকভাবে 'শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যদান যথেষ্ট নয়। তারা দাবী করেন 'শাহাদাহ'র কার্যকরী অভিব্যক্তি বা প্রদর্শনের জন্য একটি 'সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা' গড়ে তোলা আবশ্যক। এই ধরনের 'ব্যবস্থাপনা' ভিত্তিক 'শাহাদাহ' এর ধারণা কুরআনের কোথাও উল্লেখিত হয় নি। পূর্বের কোন পয়গম্বর কিংবা শেষ পয়গম্বর মহানবী মুহাম্মদ (স:) এই ধারণার বাস্তবায়ন করেন নি।

কুরআন অনুসারে— ইসলামের নবী একজন সাক্ষ্যদাতা ছিলেন (৩৩:৪৫)। নিঃসন্দেহে সত্যের সাক্ষ্যদানের কাজে তিনি নিখুঁতভাবে নিয়োজিত ছিলেন। তার মক্কা জীবন বা মদিনা জীবনে, তিনি 'সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা' গড়ে তোলার আকারে এটাকে প্রকাশ করেন নি। বস্তুত 'শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যদান হল এমন একটি কাজ যা কথার দ্বারা সম্পাদন করা হয়। পাশাপাশি যিনি 'দাওয়াহ' বা 'শাহাদাহ'র সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাকে অবশ্যই একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সৎ ব্যক্তি হতে হবে (৭:৬৮)। আবার, যিনি 'মাদু' অর্থাৎ যাকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন তাকে পরিপূর্ণ অর্থে শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আল্লাহর ব্যাপারে সৎ হতে হবে।

কুরআনে 'শাহাদাহ' শব্দটি বিভিন্ন আকারে ১৬০ বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রতিবারই তা সাক্ষ্যদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান ছাড়া অন্য কোন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি।

কুরআন অনুসারে— নবীর ভূমিকা হল, মানুষের নিকট আল্লাহর সাক্ষ্য বহন করা। শান্তিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি মানুষকে অবহিত করেন— আল্লাহ

তাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন, আখেরাত কি এবং আখেরাতে কি ঘটবে। এটাই ছিল সকল নবীর সাধারণ উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক নবী 'শাহাদাহ' বা সত্যের সাক্ষ্যদানের এই কাজটি অরাজনৈতিকভাবে পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন।

অন্তিম নবী মুহাম্মদ (স:) এর মধ্য দিয়ে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হলো, কিন্তু নবীসুলভ কর্মধারা পূর্বের মতো অব্যাহত রয়েছে। অন্তিম নবীর পর প্রতিটি যুগে প্রতিটি প্রজন্মের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এই কাজটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে 'উম্মাতে মুহাম্মদী' কে (মুহাম্মদ সঃ এর অনুসারীদেরকে)। 'শাহাদাহ' হল নবী (সঃ) এর তিরোধানের পর তার কর্মধারার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। যদি সততা ও শুভাকাঙ্খার মনোবৃত্তি নিয়ে এই কাজটি করা হয় তাহলে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এখানে সততার অর্থ হলো প্রকৃত ঐশী বাণীর সঙ্গে কোন কিছু সংযোজন বা সংমিশ্রণ না করা। এখানে শুভাকাঙ্ক্ষার অর্থ হল, যারা সত্যের সাক্ষ্যদানে নিয়োজিত তারা ঐকান্তিকভাবে 'মাদু' অর্থাৎ যাদেরকে তারা আল্লাহর দিকে আহবান করছে, তাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত

হবে যাতে তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার মত কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ অবশিষ্ট না থাকে।

মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী জনসমাজের (উম্মাহর) এই দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানবমন্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং পয়গম্বর তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন (২:১৪৩)।

এখান থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের হিসাবে, মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী জনসমাজ (উম্মাহ) অন্তিম নবী এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। তারা অন্তিম নবীর নিকট হতে আল্লাহর দ্বীন (পালনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা) গ্রহণ করে এবং কোন প্রকার প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে পরবর্তী প্রজন্মের জনগণের নিকট তা পৌঁছে দেয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকে। আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার অর্থ কেবলমাত্র একটি সাধারণ ঘোষণা নয়। কুরআনের ভাষ্য অনুসারে— দ্বীন পৌঁছে দেওয়ার কাজটি এমনভাবে করতে হবে যে তা যেন মানুষের মনকে ছুঁয়ে যায় (৪:৬৩)।

কুরআনের এই শিক্ষা অনুসারে, এই পৃথিবী সর্বকালের জন্য 'দার-উদ-দাওয়াহ' বা 'দাওয়াহ'র নিবাস বা কার্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তদনুসারে অন্তিম নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী জনসমাজ (উম্মাহ) এবং অন্যান্য জনগণের মধ্যে একটাই সম্পর্ক এবং তা হল, পূর্বোক্তগণ হলেন শাহীদ, অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্য বহনকারী, এবং পরবর্তীগণ 'মাসহুদ' অর্থাৎ যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় (৮৫:০৩)। এটাকে 'দাই' এবং 'মাদু'র মধ্যেকার সম্পর্ক হিসাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মাহর 'দাওয়াহ' বিষয়ক দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে— মুসলমানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষ্য বহনকারী (সহীহ বুখারী ২৬৪২)।

অন্তিম নবী মুহাম্মদ (স:) সাক্ষ্যবহন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তার অনুগামী জনসমাজের (উম্মাহর) উচিত ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করে এই কর্মে নিয়োজিত হওয়া। এটা একটা মহৎ কর্ম; কোন রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা বস্তুগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এই কর্মের সঙ্গে শামিল করা

কাম্য নয়। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যকে শামিল করা হয়, তাহলে কুরআনের ভাষায় তা হবে ‘রুকুন’ বা বিচ্যুতির নমুনা; যার ফলে সে কঠোর শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। কুরআনে বলা হয়েছে— ‘আর জুলুমকারীদের দিকে ঝুঁকবে না’। ঝুঁকলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন ত্রাণকর্তা নেই। অতএব তোমরা কারও সাহায্য পাবে না (১১:১১৩)।

‘দাওয়াহ’ (আহ্বান) প্রকৃত অর্থে মানুষের মনকে স্পর্শ করে

সাক্ষ্যপ্রদান বা ‘দাওয়াহ’ হল সর্বকালের জন্য একটি নবী গুণসম্পন্ন কাজ। প্রতি যুগে, প্রতি প্রজন্মের মধ্যে এই কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এই কর্মকাণ্ডের মূল বার্তা সব সময় একই থাকবে, কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি সম্পন্ন করার রীতিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে। সাক্ষ্যদান বা ‘দাওয়াহ’র কাজটি কার্যকরী করার জন্য এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে তা সর্বযুগে মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারে। ‘শাহাদাহ’ বা

'দাওয়াহ'র কাজ সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় শর্ত হল, সময় পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করে আল্লাহ ও তার দ্বীনকে যথোপযুক্ত যুক্তিসহকারে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা।

যৌক্তিকতার যুগে 'দাওয়াহ'

কয়েক শতাব্দী অতিক্রম করে 'দাওয়াহ' বা 'শাহাদাহ'র নবী-গুনসম্পন্ন কাজটি যৌক্তিকতার যুগ, একবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছেছে। আধুনিক মননকে সম্বোধন করার জন্য এখন প্রয়োজন হল আল্লাহর বাণীকে যথাযথ প্রমাণ ও যুক্তিসহ উপস্থাপন করা। এটা ছাড়া 'দাওয়াহ'র কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

সর্বোচ্চ সাক্ষ্য প্রদান

পরবর্তীকালে, দাওয়াহ তৎপরতাকে সারা বিশ্বের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তৎপরতাকে হাদীসে 'শাহাদাত-এ-আজম' বা সর্বোচ্চ সাক্ষ্য প্রদান বলা হয়েছে।

ইসলামের পয়গম্বর বলেছেন— একটা সময় আসবে যখন ‘দাওয়াহ’র কাজ যথাযথ যুক্তি (হুজ্জাত) সহকারে করার প্রয়োজন হবে। যারা তাদের সময়কালের যৌক্তিক মানদন্ড অনুসারে যুক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর বাণীকে উপস্থাপন করবে, তারা আল্লাহর নিকট মহা পুরস্কারের দাবীদার হতে পারবে। এই ধরনের লোকদের ‘দাওয়াহ’ কর্ম সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে— ‘বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই হল সর্বোচ্চ সাক্ষ্যপ্রদান’ (সহীহ মুসলিম, ২৯৩৮)।

‘শাহাদাহ’র ধারণা অনুসরণের ক্ষেত্রে বিকৃতি সমূহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ‘শাহাদাহ’র ধারণা অবিকলভাবে পূর্বোক্ত বর্ণনার মতো ছিল। ঐ সময়ের ‘শাহাদাহ’ শব্দটি সত্যের সাক্ষ্যদান অর্থে ব্যবহার করা হতো। আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা বোঝাতে পারিভাষিক শব্দ ‘ক্বিতাল’ ব্যবহার করা হতো। উদাহরণস্বরূপ কুরআনে বলা আছে— যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে

(ইয়ুকতালু ফি সাবিলিল্লাহ) তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা জানো না (০২:১৫৪)।

কুরআনের দৃষ্টিতে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে বলা হবে 'মাকতুল ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে এমন ব্যক্তি)। নিঃসন্দেহে, এই ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে একটি মহা-পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন, মানুষের নিকট তিনি 'মাকতুল ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে নিহত বলে পরিচিত হবেন। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ওহুদ যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) এর ৭০ জন সহচর নিহত হয়েছিলেন। একটি রেওয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— ওহুদের দিনে নবী (সঃ) এর সাহচরদের মধ্যে ৭০ জন নিহত হন (সহীহ বুখারী, ৪০৭৮)। এই উদাহরণটি থেকে বোঝা যায় নবী (সঃ) এর সময় কালে আল্লাহর পথে যারা নিহত হতেন তাদেরকে 'মাকতুল' বলা হতো, শহীদ বলা হতো না।

নবী (সঃ) এর সময়কালের পরে, তার সহচর (সাহাবী) দের যুগ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের যুগকে ইসলামের ইতিহাসে প্রামানিক যুগ হিসাবে গণ্য করা হয়। এদের সময় কালেও যারা আল্লাহর পথে নিহত হতেন তাদেরকে পূর্বের নেয় 'মাকতুল ফি সাবিলিল্লাহ' বলা

হতো। কিন্তু এর পরবর্তী সময়কালে ‘শাহাদাহ’ শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে। অন্যান্য ইসলামী অনুশাসন অনুধাবনের ক্ষেত্রে এতটাই পরিবর্তন আসে যে মুসলমানগণ প্রায় ভুলেই যায় যে ‘শাহাদাহ’ শব্দের অর্থ ‘দাওয়াহ’ এবং এই শব্দটি শহীদ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে, একটি নতুন ধারণা গড়ে ওঠে— যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। তাদের নামের সঙ্গে শহীদ কথাটি যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ হাসান আল বান্না (মিশরে ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’ এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন) হাসান আল বান্না শহীদ নামে পরিচিত হন, সাইদ কুতুব (‘মুসলিম ব্রাদারহুড’ এর তাত্ত্বিক নেতা, যাকে ১৯৬৬ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়) পরিচিত হন সাইদ কুতুব শহীদ নামে, সাইদ আহমেদ (তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৮৩১ সালে নিহত হন) পরিচিত হন সাইদ আহমেদ শহীদ নামে, শাহ ইসমাইল (সাইদ আহমদ এর অনুসারী, একই সাথে নিহত হন) পরিচিত হন ইসমাইল শহীদ নামে— এছাড়া আরও অনেক উদাহরণ আছে। নবী (সঃ) এর অনেক সাহাবী বা সহচর তাদের জীবন উৎসর্গ

করেছিলেন, কিন্তু তাদের নামের সাথে শহীদ শব্দটি যুক্ত করা হয়নি। খালিফা ওমর ইবনে আল খাত্তাব, ওসমান ইবনে আফফান এবং আলী ইবনে আবু তালিব প্রত্যেকেই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু তারা কখনোই ওমর ইবনে আল খাত্তাব শহীদ, ওসমান ইবনে আফফান শহীদ বা আলী ইবনে আবু তালিব শহীদ নামে আখ্যাত হন না। নবী (সঃ) এর সাহচরদের নাম সর্বদা তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে লেখা বা বলা হয়ে থাকে— যেমন আলী ইবনে আবু তালিব (আবু তালিব এর পুত্র আলী); কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত রীতি অনুযায়ী তাদের নামের সঙ্গে কখনও শহীদ কথাটি যুক্ত করা হয়নি। একইভাবে, ইমাম বুখারীর হাদিস সংকলনের একটি অধ্যায় রয়েছে যার শিরোনাম 'বাব লা ইয়াকুলু ফুলান শহীদ', যার অর্থ 'কাউকে শহীদ হিসাবে আহ্বান না করার অধ্যায়'।

এটা কোন সামান্য ব্যাপার নয়। ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো কোন ব্যক্তিকে তার পিতার সূত্র ধরে নামকরণ করা। কুরআনে বলা আছে— 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাকো, এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর (৩৩:০৫)। কোন ব্যক্তির নামের সঙ্গে শহীদ বা এই ধরনের অন্য কোন শব্দ যুক্ত করলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে

একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়। এটা ইসলামী শিষ্টাচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

‘শাহাদাহ’ এবং শহীদ সম্পর্কে এই ইসলাম বহির্ভূত চর্চা আজ চরম সীমায় পৌঁছেছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তার মূল কারণ এটাই। এই সহিংসতার কারণে যে মুসলিম মারা যায় তাকে শহীদ উপাধি দেওয়া হয় এবং শহীদ হিসাবে তাকে সম্মানিত করা হয় এবং দাবী করা হয় মৃত্যুর সাথে সাথে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই ধরনের অভিব্যক্তির সূত্রপাত ঘটে ইউরোপীয় উপনিবেশিকতার যুগে। এই সময়ে, বিভিন্ন পশ্চিমা শক্তি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের ভ্রান্ত নির্দেশনার কারণে, মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এই অভিঘাত প্রথমে চরম ঘৃণার রূপ নেয়, তারপর তা ধাপে ধাপে চরম সহিংসতায় পরিণতি লাভ করে।

এই সহিংসতাকে পুণ্য কর্ম (holy) হিসাবে উপস্থাপন করে দাবী করা হতে থাকে যে এই সহিংসতা বিস্তার করে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা ‘শহীদ’ এবং তারা

বিনা বিচারে অবিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিঃসন্দেহে এটা হল স্বকপোল কল্পিত দাবী, কুরআন ও হাদিসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর এই চরম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক রূপ গ্রহণ করে তা আত্মঘাতী বোমা হামলা রূপে মুসলমানদের মধ্যে শিকড় বিস্তার করেছে। এটিকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য এবং পুণ্য কর্ম হিসেবে মহিমান্বিত করার জন্য, কিছু উলেমা বা মুসলমান পন্ডিতগন অন্যায়ভাবে এটাকে 'ইসতিশহাদ' বা শহীদ হওয়ার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। সেইজন্য বিপুল সংখ্যক মুসলমান 'শাহাদাহ'র নাম করে তাদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে, কিন্তু মুসলমান উলেমাগণ বা মুসলমান জনসাধারণ প্রকৃত 'শাহাদাহ' কর্মে নিয়োজিত হতে আগ্রহী বলে মনে হয় না— প্রকৃত 'শাহাদাহ' হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যারা তথাকথিত 'শাহাদাহ'র ধ্বজাধারীদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছে, তারা আসলে মুসলমানদের নিকট 'মাদু', যাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া মুসলমানদের জন্য কর্তব্য ছিল, 'মাদু'দের হত্যা করা ইসলামে অনুমোদনযোগ্য নয়।

প্রাচীন ইহুদিদের অনুকরণ

একটি হাদিসে বলা হয়েছে, এক সময় মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারীরা ইহুদীদের অনুসরণ করবে। নবী (সঃ) বলেন— 'তোমরা (মুসলমানরা) নিশ্চয়ই প্রতি বিঘতে, প্রতি হাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে থাকবে; এত বেশি পরিমাণে যে, যদি তারা সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরাও প্রবেশ করবে।' সহচরগণ (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করলেন— হে আল্লাহর নবী, তারা কি ইহুদি ও খ্রিস্টান?' নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা?' সহীহ বুখারী, ৭৩২০)।

এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম, কুরআনে এটাকে সময়ের সাথে হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে— তাদের হৃদয় সময়ের সাথে কঠোর হয়ে গেছে (৫৭:১৬) অর্থাৎ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়, যার ফলে নানা প্রকার ব্যাধি বাসা বাঁধে। বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে অবক্ষয়ের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হল সত্যের সাক্ষ্যদানের নাম করে প্রাচীন ইহুদিদের অনুকরণ করা। আল্লাহ ইহুদিদেরকে তাদের ধর্মের সাক্ষী হিসেবে নিযুক্ত

করেছিলেন। বাইবেলে বলা আছে— প্রভু ঘোষণা করলেন 'তোমরা আমার সাক্ষ্যদাতা ও সেবক যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, যাতে তোমরা আমাকে বুঝতে পারো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো এবং জানতে পারো যে আমি হলাম 'তিনি'। আমার আগে কোন দেবতা সৃষ্টি হয়নি, আমার পরে কেউ সৃষ্ট হবে না।'

পরবর্তীকালে যখন ইহুদিদের মধ্যে অবক্ষয়ের সূচনা হলো, মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করার কাজটি তখন তারা পরিত্যাগ করল। কারণ এই অবক্ষয়িত মানসিকতা তাদের মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্ম দিল। ইতিহাসে এটা ইহুদী 'আধিপত্যবাদ' নামে পরিচিত। এই কারণে তাদের চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র তাদের সম্প্রদায়ের বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। তারা আর অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী রইল না। বস্তুত, তারা অন্যদেরকে তাদের জাতির শত্রু হিসেবে দেখতে লাগলো, কারণ অন্যান্যরা তাদের নিজ উদ্ভাবিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী মেনে নিল না। সেই জন্য ইহুদীরা আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষ্যদানের কাজ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের ব্যাপারে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিষয়ে তাদেরকে আবদ্ধ রাখলো। তাদের

এই চূড়ান্ত স্ব-ধর্ম চেতনার পাশাপাশি তারা দাবী করতে থাকল যে তারা তাদের নবী, মূসা (আ:) এর প্রচারিত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইহুদিদের এই বিষয়টি কুরআনের উদ্ধৃত আছে—"যখন আল্লাহ গ্রন্থধারীদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর গ্রন্থ পূর্ণরূপে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে এবং কোন কিছু গোপন করবে না; কিন্তু তারা একথা পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছিল এবং এটাকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করেছিল। কত খারাপ যা তারা ক্রয় করেছিল। যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রসন্ন থাকে এবং যারা চায়, যে কাজ তারা করেনি তার জন্য প্রশংসা হোক, এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৩:১৮৭-১৮৮)।

একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সাম্প্রতিককালের মুসলমানগণ এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন ইহুদিদের অনুসারী হয়ে গেছে। কার্যত তারা 'দাওয়াহ' বা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজ পরিত্যাগ করেছে। পরিবর্তে তারা কেবলমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের ব্যাপারেই

সীমাবদ্ধ থাকছে এবং ভ্রান্তভাবে তারা এটাকেই 'দাওয়াহ' মনে করছে। তারা 'শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যদানের ধারণাকে পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং এটাকে 'শহীদ' অর্থে ব্যবহার করছে। তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে এবং তারা যখন তাদের নিজ উদ্ভাবিত রাজনীতি অনুসরণ করছে তখন তাদের কিছু লোক নিহত হচ্ছে এবং তারা তাদেরকে শহীদ উপাধি দিচ্ছে এবং দাবী করছে যে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে তারা 'দাওয়াহ' এবং 'শাহাদাহ' এর কাজ করে চলেছে।

মানুষ যে উপায়ে তার কর্ম সম্পাদন করে তার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক আবেগ ও কারণগুলি প্রকাশিত হয়। 'দাওয়াহ' কর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য অন্যের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষাসূচক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানদের অবক্ষয়ের কারণে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আধিপত্যবাদ চরম রূপ ধারণ করে, যার কারণে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের থেকে নিকৃষ্ট এবং তাদের শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করে। এই মানসিকতার ফল হল, তারা আর অন্যদের শুভাকাঙ্ক্ষী রইল না। সাধারণভাবে বলতে গেলে বর্তমানে মুসলমানগন এই মুসলিম সম্প্রদায়িক মানসিকতার শিকার।

মুসলমানদের মধ্য হতে 'দাওয়াহ' কর্মে উৎসাহ অন্তর্হিত হওয়ার এটাই হলো মূল কারণ। তারা দাবী করে যে তাদের কার্যক্রম 'নিজাম-ই- মুস্তাফা' (নবীর ব্যবস্থাপনা) কে উন্নতিবর্ধন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তারা যা করে তার সঙ্গে 'নিজাম-ই-মুস্তাফা'র কোন সম্পর্ক নেই।

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা কুরআনে বর্ণিত অবক্ষয় ক্লিষ্ট ইহুদীদের মত— 'যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রসন্ন থাকে এবং যারা চায়, যে কাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক, এমন লোকদের শাস্তি থেকে রেহাই প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৩:১৮৮)।

কুরআনের এই কথাগুলি বর্তমান দিনের মুসলমানদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে প্রযোজ্য। এই মুসলমানগণ তাদের সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের জন্য 'দাওয়াহ' বা 'শাহাদাহ'র মর্যাদা পেতে চায়, কিন্তু আল্লাহর বিধান অনুসারে, তা কখনোই সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এই ধরনের মনোবৃত্তি আল্লাহর নিকট শাস্তিযোগ্য এবং নিশ্চিতভাবে কোন পুরস্কারের যোগ্য নয়।

আত্মঘাতী বোমা হামলা

বর্তমানে মুসলমানদের অবক্ষয়িত সাম্প্রদায়িক মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন ভাবধারা 'তাহলিল-ই-হারাম' বা নিয়ম বিরুদ্ধ কে নিয়ম সিদ্ধ করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই অপচেষ্টা হল আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ— অর্থাৎ নিজের শরীরে বোমা বেঁধে একজন কথিত শত্রুকে হত্যা করার জন্য নিজেকে উড়িয়ে দেওয়া।

ইসলামী শরীয়তের নিয়ম অনুসারে এই কাজটি নিঃসন্দেহে হারাম বা নিষিদ্ধ। কিছু মুসলমান পন্ডিত নিজেদের মতো করে দাবী করে যে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ হল 'ইসতিশহাদ' বা শহীদ হওয়ার প্রচেষ্টা, সুতরাং এটা বৈধ। এই ধরনের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। এই ধরনের আত্ম-উদ্ভাবিত ফতোয়া আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের মত স্পষ্ট এবং দ্বার্থহীনভাবে নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করতে পারে না।

এই সম্পর্কে হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সহীহ আল বুখারী (হাদিস নং ৩০৬২), সহীহ মুসলিম

(হাদিস নং ১১২) মুসনাদ ইমাম আহমেদ (হাদিস নং ৮০৯০) ইত্যাদি হাদিসগ্রন্থে এই সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই বিষয়ক বর্ণনাটি মোটামুটি ভাবে অভিন্ন। বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) এর একজন সাহাবী (সহচর) বর্ণনা করেন— "আমরা একটি যুদ্ধে (গাযওয়া) নবী (স:) এর সাথী হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কুজমান নামে এক ব্যক্তি ছিল যে ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল। যুদ্ধে সাহসিকতা দেখানোর জন্য সকলেই নবী (স:) এর সামনে তার প্রশংসা করতে থাকলো। কিন্তু নবী (স:) বললেন- 'ইন্নাহু মিন আহল ইন নার', অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে দোযখের অন্যতম বাসিন্দা।' নবী (স:) এর এই কথা শুনে সাহাবীগণ হতবাক হয়ে গেল। সেইজন্য তিনি তাদেরকে সেখানে গিয়ে তদন্ত করতে বললেন। তারা জানতে পারল কুজমান যুদ্ধের সময় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল এবং যখন সে আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারল না, তখন সে নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল। যখন নবী (সঃ) কে বিষয়টি বলা হলো, তিনি বললেন, 'আল্লাহ মহান এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি তার রাসূল।'

এটা সত্য যে ইসলামে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ ভাবে

হারাম বা নিষিদ্ধ— বিষয়টি এত গুরুতর যে কোন ব্যক্তি যদি সাহাবী হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং অবশেষে নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেন, ঐ আত্মহত্যার জন্য তার মৃত্যু হবে অবৈধ। কোন অজুহাতে এটাকে বৈধ করা যাবে না।

ধরা যাক কিছু মুসলমান আক্রান্ত হল এবং তারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করলো এবং যুদ্ধ করতে করতে মারা গেল। এই ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু জায়েজ বা বৈধ হবে। কিন্তু যদি তারা জেনেশুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের শরীরে বোমা বেঁধে নেয় এবং তারপর কথিত শত্রুদের মধ্যে ঢুকে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং এইভাবে অন্যদেরকে এবং নিজেদেরকে হত্যা করে, তাহলে সেটা স্পষ্টভাবে এক প্রকারের আত্মহত্যার শামিল এবং নিশ্চিতভাবে এটা ইসলামে অবৈধ।

আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করা বিশ্বাসীদের জন্য বৈধ। যদি তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাদের উচিত ধৈর্য ধারণ করা, আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো নয়। কিন্তু আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ধন্দ কিছু মুসলমানদের মধ্যে এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে তারা ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বিষয়টি গুরুত্বসহ চিন্তা করতে রাজি নয়।

অনর্থক যুদ্ধ

একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী (সঃ) বলেছেন— 'যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ, এমন সময় না আসা পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না যখন হত্যাকারী জানবে না কেন সে হত্যা করেছে, এবং নিহত ব্যক্তি জানবে না কেন সে নিহত হলো।' তখন কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, কেন এমন হবে। তিনি উত্তরে বললেন, 'আল হারজ' (যুদ্ধ ও রক্তপাত) এর যুগে এমন ঘটনা ঘটবে। হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোজখে যাবে (সহীহ মুসলিম, ২৯০৮)।

হাদিসের ভাষ্যকারগন সাধারণত 'হারজ' শব্দটি অত্যাধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত হিসাবে অনুবাদ করে থাকেন। মানুষ সাম্প্রদায়িক আধিপত্যবাদ দ্বারা চালিত হয়ে যখন অন্যের প্রতি অন্ধভাবে শত্রুতা পোষণ করে তখন এই ধরনের অনর্থক উন্মত্ত হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে। এটাই হলো বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা। এই ধরনের মানসিকতা তাদের মধ্যে এত ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে তারা তাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়কে শত্রু মনে করছে। তারা কল্পনা করতে

শুরু করেছে যে অন্যান্যরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। তাদের মনগড়া ধারনার কারণে তাদের অন্তর অন্যদের প্রতি ঘৃণার অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে আছে। এর ফলস্রুতিতে মুসলমানদের মধ্যে আজ চরমপন্থী সহিংসতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা কেবলমাত্র অন্যদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না, স্বধর্মীয় লোকজনদের মধ্যে যাদেরকে তারা তাদের শত্রুদের সমর্থক বলে মনে করে তাদের প্রতিও ঘৃণা পোষণ করে থাকে।

আজ, বহু মুসলমান সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ভয়ংকর সহিংস কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত— তারা বিদ্যালয়ের ছোট শিশুদের, মসজিদের ইবাদতকারীদের এবং কবরস্থানে মৃতদের জন্য শোকার্ত মানুষদেরও রেহাই দিচ্ছে না। সম্পূর্ণ নিরর্থক এই হত্যা লীলা এখন এমন ভয়ংকর রূপ নিয়েছে যে সন্ত্রাসীরা এটাকে একটা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে, যদিও তাদের কাছে এই সম্পর্কে কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ মজুদ নেই।

সমস্যার সমাধান

আজকের মুসলমান উম্মাহর এই চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হল তাদেরকে সঠিক ভাবাদর্শ প্রদান করা। যে মুসলমানগন সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে তারা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে। এই অবস্থা পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় হল কুরআন এবং হাদিসের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ অনুধাবন করতে সক্ষম করে তোলা। এই অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এর চেয়ে ন্যূনতম অন্য কোন উপায় নেই।

উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বর্ণিত (৪১:৩৪-৩৬) এই মৌলিক সত্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করতে হবে— "ভালো আর মন্দ দুটো সমান নয়, মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা, দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই গুণটি কেবল ধৈর্যশীলরাই পায়, এই গুনটি কেবল পরম ভাগ্যবানদেরকেই দেওয়া হয়। যদি শয়তানের কোন

কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ কর। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।"

কুরআনের এই অনুচ্ছেদ অনুসারে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বন্ধু ও শত্রুর মধ্যেকার পার্থক্য নয় বরং প্রকৃত বন্ধু এবং সম্ভাব্য বন্ধুর মধ্যেকার পার্থক্য। এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। এই অনুসারে, মুসলমানদের উচিত কাউকে শত্রু মনে না করা। কারো প্রতি বৈষম্য না করে, বরং সকলকে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করা উচিত। এটাই হলো 'দাওয়াহ'র মূলনীতি, এটাকেই বলে 'দাওয়াহ' বা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা।

এইভাবে কুরআনে বর্ণিত এই বিষয়টি মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ। 'এজন্যেই আমি ইসরাইলের সন্তানদের জন্য বিধান দিয়েছিলাম, যে ব্যক্তি কোন মানুষ হত্যার শাস্তি কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল; আবার কেউ যদি কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল (০৫:৩২)।

অনুরূপভাবে, মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিতে

হবে— একজন মুসলমানের জন্য অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করা এমন একটি কাজ যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কুরআনে বলা আছে— 'যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসী কে জেনেশুনে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও প্রত্যাখ্যান, আল্লাহ তার জন্য বড় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (৪:৯৩)।

নবী (সঃ) এর অন্তিম ইচ্ছা

আজ বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলমানদেরকে 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ) উপলক্ষে জারি করা নবী (সঃ) এর একটি সতর্ক বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া খুবই জরুরী। সহীহ আল বুখারীর একটি বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে যে— 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, কুরবানির দিনে নবী (সঃ) একটি ধর্মোপদেশ মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মানবমন্ডলী, এটা কোন দিন?" তারা উত্তর দিল, "একটি পবিত্র দিন।" তারপর তিনি বললেন, "এটা কোন শহর?" তারা উত্তর দিল, "একটি পবিত্র শহর।" তারপর তিনি বললেন, "এটা কোন মাস?" তারা উত্তর দিল, "একটি পবিত্র মাস।" নবী (সঃ) বললেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পত্তি এবং

তোমাদের সম্মান এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং অলংঘনীয়।" নবী (সঃ) এই কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুললেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ, আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, "যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ, এটাই হলো নবী (সঃ) এর অন্তিম ইচ্ছা তার অনুসারীদের জন্য। অতএব যারা উপস্থিত আছে তারা যেন এই বার্তা যারা উপস্থিত নেই তাদের নিকটে পৌঁছে দেয়। "অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) এর এই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন, "আমার পরে তোমরা অবিশ্বাসী হয়ে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করো না।" (সহীহ আল বুখারী, ১৭৩৯)

মুসলমানদের করণীয়

বর্তমান দিনে মুসলমান জনসমাজ কমবেশি নেতিবাচক চিন্তনে নিমজ্জিত। এর একমাত্র কারণ হলো অবক্ষয়িত মানসিকতা। নেতিবাচক চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়ে তারা অনাবশ্যকভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের

শত্রু মনে করছে। কিছু কিছু মুসলমান এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেবলমাত্র তাদের ভাবনার স্তরেই সীমাবদ্ধ রেখেছে, আবার অন্যান্যরা এই মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুতর বিপদ সংকেত; বহু শতাব্দী আগে নবী (স:) এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ইতিবাচক চিন্তাধারা গড়ে তোলা আজকের মুসলমানদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজেদের শত্রু বিবেচনা করা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। তাদেরকে এই সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তাদের প্রতিষ্ঠা একটি সম্প্রদায় হিসেবে নয় বরং মতাদর্শগত একটি গোষ্ঠী হিসাবে, যাদের একটাই লক্ষ্য এবং তা হল 'দাওয়াহ' অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা। অন্যদের প্রতি একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই কাজে নিয়োজিত হবে। এমনকি যদি তাদের মনে হয় যে অন্যান্যরা তাদের উপর অত্যাচার বা দুর্ব্যবহার করছে, তবুও তা উপেক্ষা করে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে হবে, এবং আল্লাহর বাণী তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে— এই বাণী

কুরআন ও সুন্নাহ বা নবী (সঃ) এর অনুসৃত কর্মধারার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। এ ছাড়া অন্য কোন কার্যকলাপ পরকালের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

গত এক শতাব্দী ধরে ইসলামের নামে সহিংসতা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে, তবুও এর মাধ্যমে কোনো ইতিবাচক ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। এটা একটা পরিপূর্ণ ব্যর্থশ্রম। মুসলমানগন যে ধরনের সহিংস কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়েছে তা মুসলমানদের পক্ষে প্রতিকূল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সহিংসতার এই নেতিবাচক ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে মুসলমানগণ এই ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়নি। যদি তারা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সফল হতো। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উচিত, তারা যা করছে তা পুনর্বিবেচনা করা। তাদেরকে অবশ্যই সহিংসতা বর্জন করতে হবে, এবং এর পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ 'দাওয়াহ' কর্মে নিযুক্ত হতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

মুসলমান জনসমাজের প্রধান লক্ষ্য হলো দাওয়াহ বা আহ্বান। এর অর্থ হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বোধগম্য ভাবে মানুষের নিকট জীবনের বাস্তবতা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। দাওয়াহ'র লক্ষ্য হলো সত্য সন্ধানীদেরকে আল্লাহর সৃজন পরিকল্পনা অনুধাবন করতে সক্ষম করে তোলা।

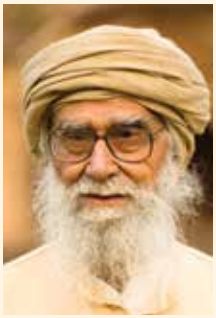

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৯২৫-২০২১) ছিলেন একজন ইসলামিক পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শান্তির দূত। তাঁর কাজের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি ২০০ টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং সেই সাথে অসংখ্য বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের আধ্যাত্মিক অর্থের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত আধুনিক শৈলীতে করেছেন। তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটি সহজ, স্পষ্ট এবং সমসাময়িক শৈলীতে লিখিত, এবং তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি শান্তির সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনকে প্রণোদিত করতে এবং শান্তি, অহিংসা এবং আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামকে আধুনিক ভাবে উপস্থাপন করতে ২০০১ সালে সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেন।

www.mwkhan.com www.cpsglobal.org

Goodword Books
CPS International

PDF

ISBN 978-93-89766-44-8